সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিঠিপত্র - অন্তর্দেশ থেকে আন্তর্জাতিকতা

অনিন্দিতা দত্ত, *সহকারী অধ্যাপিকা, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, বেথুন মহাবিদ্যালয়, কোলকাতা*

সারসংক্ষেপ ঃ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র চিঠিপত্র প্রত্যক্ষে পরোক্ষে অন্তর্দেশ থেকে আন্তর্জাতিক নানামাত্রিক চিন্তন রেখাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে শিল্পিত হয়ে পরিণত হয়েছে স্বয়ং এক প্রশ্নাতীত সাহিত্যশরীরে। সমাজ এবং সাহিত্য এক অবিচ্ছেদ্য ধারায় গ্রথিত তাঁর পত্রসমুহের গভীর বয়ানে। সময়-অস্তিত্ব-দর্শন সমস্ত কিছুই তাঁর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অবশ্যই ধর্মীয়চেতনার দিগন্ত বলয়ের সঙ্গে তীব্র ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে পত্রের অকৃত্রিম আত্মভাষায়।

মূল শব্দগুচ্ছ ঃ অন্তর্দেশ, আন্তর্জাতিক, চিঠিপত্র, মুসলিম জনমানস, আর্থ-সামাজিক, নিঃসঙ্গতা, নির্মাণ, রাজনৈতিক, ধর্মতন্ত্র।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ব্যক্তিগত পত্রসমূহে গাঢ় এক জীবনবোধের সুদীর্ঘ আলোকবর্ষ স্পর্শ করে আছে তাঁর মানস পৃথিবীর একান্ত নিবিড় শরীরটিকে। সময়-অস্তিত্ব-দর্শন সমস্ত কিছুই তাঁর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অবশ্যই ধর্মীয়চেতনার দিগন্ত বলয়ের সঙ্গে তীব্র ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে পত্রের অকৃত্তিম আত্মভাষায়। লেখক ও পাঠকের যৌগিক গৃহীত ভূমিকা, সচেতন সত্তায় সাহিত্যের আন্তর্জালিক বয়ান নির্মাণ এবং তার প্রতি অতি বিশেষ দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি যেমন পত্রে আলোচিত তেমনি অ-দৃষ্ট থাকে নি সাহিত্য ও সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত একান্ত মূল্যবান মতামতটিও।

তিরিশের কথাশিল্পীদের শিল্পের জন্য শিল্পের নীতি গ্রাহ্য না করে, শিল্পের মাধ্যমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপর বাঙালি মুসলমান সমাজ এবং তার চিন্তন কেন্দ্রিক দারিদ্র্যকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। সূক্ষ্মতর বোধের সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিতুলনায় মুসলমান সমাজ-বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃস্ফূর্ত লিখন অভিযানটি তাঁর লেখক হিসেবে দায়বদ্ধতায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সমসাময়িক এক লেখককে পত্র-মারফত জানান —

> "কিন্তু কথা হচ্ছে 'I want to write' মুসলমান সমাজকে নিয়ে — আমার সমগ্র মনের ইচ্ছা সেদিক পানে। এ-ও একরকম Passion থেকে সৃষ্ট। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ হয়তো অজ্ঞ নেই; কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা — এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত (?) করতে চাই। আমি আমার আঁকা ছবিতে সে সমাজকে প্রতিফলিত করতে চাই, যাতে তারা নিজের সুষ্ঠু চেহারা দেখবার সুযোগ পায়।"১

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর ফরাসি পত্নী অ্যান মারির স্মৃতিচারণা —

"সফেক্লিসের মতো প্রাচীন গ্রীক লেখকই হোক আর ফরাসি জগতের বা বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই হোক...তাদের পদ্ধতি বা তাদের কাছে থেকে যা কিছু সে আদায় করতে পেরেছে, তার সবই সে তার নিজের সংস্কৃতি ও মানুষ — পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষদের ওপর প্রয়োগ করত। ও তার লেখার মাধ্যমে ওর দেশের মানুষের দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতা দূর করার জন্য যতটা সম্ভব ভূমিকা রাখতে চাইত।"২

আসলে, যেখানে 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি' সেই শিক্ষাহীন দেশীয় রুক্ষ প্রান্তরে সমাজ-মানসের গাঢ় ধূসর বিন্যাসটিই তাঁর সাহিত্যে বারবার প্রতিবিম্বিত। পূর্ববাংলার বিশেষত, গ্রামীণ মুসলমান সমাজের গভীর, গভীরতর অসুখটি তাঁর সাহিত্যে যথার্থ চিহ্নিত। অশিক্ষাজনিত কুসংস্কারের দূর্ভেদ্য অন্ধকারে ঔপনিবেশিক ধর্মতন্ত্রের গভীর অচলায়তনটি তীক্ষ্ণ শ্লেষে বিদ্ধ তাঁর 'লালসালু'তে। তাঁর 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের অবচেতনেও গ্রামীণ প্রেক্ষিতে আর্থ-ধর্মীয় নিপীড়নের সূক্ষ্ম কাঠামোগত রূপটি দুর্লক্ষ থাকে নি। রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্মতান্ত্রিকতা নির্মিত ক্ষমতার অপব্যবহারে অপরাধের যে মনন তৈরি হয় তা অস্তিত্ববাদের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে উপন্যাসটিতে। প্রকৃতঅর্থে জীবনানন্দীয় ভাষ্যে 'স্থির দিকনির্ণয়ের চেতনা' নিয়ে লেখক তাঁর কথন-বিশ্বের সামাজিক পরিসরটি সম্পর্কে প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। পত্রে তারই প্রকাশ।

আবার, পূর্ববাংলার মুষ্টিমেয় মুসলিম জনমানস এবং সাহিত্যের উন্নত মাত্রা — এ দুয়ের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগের ব্যর্থতা ব্যক্ত হয়েছে ১৯৪৩ এর জুলাই মাসে আফসাউদ্দিনকে লেখা চিঠিখানিতে। নাগরিক সমাজের আধুনিকতম সাহিত্য নয়, বরং 'সভ্যতার জঞ্জাল'-স্বরূপ গ্রামীণ মুসলিম সমাজের প্রায়োগিক ক্ষেত্রটি বিচার করে তার উপযুক্ত সাহিত্য নির্মাণই তাঁর কাঙ্ক্ষিত দিকনির্দেশ। অন্যদিকে ১৯৫৪-র ডিসেম্বরে ঢাকা থেকে স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে দারিদ্রের প্রতি চূড়ান্ত সংবেদনশীলতা এবং তার থেকে সৃষ্ট যন্ত্রণাবোধের ভিতরেও কর্ম বিশেষত সাহিত্য নির্মাণের মাধ্যমে এই অভাবী মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর এবং সর্বগ্রাসী আর্থ-সামাজিক অসুখের প্রতিরোধ প্রচেষ্টার দৃঢ় সংকল্পটি লক্ষিত হয়। কেবলমাত্র

সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধতাই নয়, সাহিত্য যে জনগণের প্রতিও দায়বদ্ধ এই প্রকৃত সত্যটি কোনও রকম চিন্তনগত অস্পষ্টতা ছাড়াই তাঁর উপলব্ধিতে সুস্পস্ট হয়ে ওঠে।

১৯৫৪-র নভেম্বরে সিডনিতে স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ওয়ালীউল্লাহর বক্তব্য — system বা পদ্ধতির বাইরে অবস্থান করেই তার অন্তর কাঠামোটি নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। পদ্ধতির অংশ হলে তাতে একটা শাব্দিক বিগ্রহই তৈরি হয় মাত্র, কোনও ইতিহাস, সমাজ কিংবা দর্শনজাত চিন্তাস্রোত তরঙ্গায়িত হয় না। গ্রামীণ প্রতিবেশের মধ্যে থেকে সাহিত্যে চিত্রধার্মিক প্রতিফলনের বিবৃতি দেওয়া নয়, বরং সময়ের সচেতন বোধে মানব-সম্পর্ক ও তার অবস্থানের আন্তর্জালিক কাঠামো এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার অস্তিত্বের যাথার্থ্য নির্ণয় করার ক্ষেত্রেই তিনি বিশেষ পক্ষপাতী তথা আগ্রহী ছিলেন। অথচ তাঁর সৃজিত সাহিত্যের সমকালীন পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় এর বিপরীত মানসিকতাই বারবার লক্ষিত হয়। বিদেশে দীর্ঘ নাগরিক অবস্থিতিতে দেশীয় গ্রামীণ অভিজ্ঞতার অভাব হেতু অবাস্তবতার অভিযোগে আক্রান্ত হতে হয় তাঁর সাহিত্যকে। ব্যথিত স্রষ্টার পত্রে তাই সনির্বন্ধ অনুযোগ —

"এমন লোকে জানো যে বেশ বিদগ্ধ মানুষ কিন্তু জানে না আমি বিদেশে থাকি? তেমন লোকের মত শুনতে ইচ্ছা করে। একটা কথা, বিদেশে থাকলেও দেশান্তর ঘটেনি ঃ মানে ইমিগ্রেন্ট এর ফলে ঢুকিনি।" (১৯৬৮ তে শওকত ওসমানকে লিখিত পত্র)

উল্লেখ্য অ্যান মারির উক্তি —

"He wanted to write and contribute by his writings to alleviate as par as he could– the poverty of his country. So critics who have labeled him westernized– have misunderstood him."৪

অপব্যাখ্যার অবক্ষয়িত পরিমন্ডলে স্রষ্টা কখনও স্বয়ং ব্যাখ্যাতা। ফরাসি প্রকাশকের কাছে তাঁর লেখা চিঠিটিতে 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটির যে স্ব-বিশ্লেষণ করেছেন তা কেবলমাত্র সাহিত্যিক সমালোচনাই হয়ে ওঠে নি, সাহিত্য সৃষ্টির সামাজিক যন্ত্রণাগত তাড়নাটিও এখানে পরিস্ফুট। লেখক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে মানব-অস্তিত্বের গভীরতম সংকট এবং জটিলতায় তিনি কোনও বহির্দর্শক নন, তার নিজের ভিতরেই রয়েছে এই আক্রান্ত চরাচর। সমাজ-মানবিক এই ক্ষতের দার্শনিক অন্বেষণটি তাঁর চিঠির বয়ানে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনীশক্তির শিকড়টি তাঁর সাহিত্যিক বোধ এবং গাঢ় আকাঙ্ক্ষার ভিতরেই প্রকৃত নিমজ্জিত। পেশাগত যান্ত্রিকতা তাঁকে ক্লান্ত করে তুলতো, হয়তো কিছুটা বিষণ্ণও। এই আবদ্ধ গুমোট পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে বারবার স্বাধীন শ্বাসগ্রহণের জন্য তিনি আঁকড়ে ধরেছেন তাঁর শেষ আশ্রয় সাহিত্যকে। ১৯৫৪-র নভেম্বরে স্ত্রী-কে লেখা পত্রে তাঁরই প্রতিবিম্বন —

"নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব অনিশ্চয়তায় ভুগছি। ভবিষ্যতে কী করব জানি না; কেননা এখন যা করছি তা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্য কোন সুযোগ এখন খোলা নেই। অদূর ভবিষ্যতেও সেগুলোর ফিরে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ...এজন্যই যে বইটি এখন লিখছি তার ওপর এত ভরসা।"৫

১৯৫৬-র ১২ই সেপ্টেম্বর নাজমূল করিমকে লিখেছেন —

"I am rather unhappy because I can not write. I have not been able to finish the novel in English I started in Dacca. This sort of diplomatic life is so empty and pointless. I do not think I would have ever turned out to be a writer of any worth but that is a dream that has hunted me from my very childhood days."৬

ওয়ালীউল্লাহর পাঠ-বিশ্বটিও স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মানসিকতা অনুযায়ী কোনও সীমিত বৃত্তচক্রে গতানুগতিক পরিক্রমায় আবদ্ধ ছিল না, এবং পাঠক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাটি ছিল তীব্র এবং ব্যাপ্তি ছিল বিশ্ব সাহিত্য ও দর্শনের বিবিধ ক্ষেত্রে। পশ্চিমা-অপশ্চিমা সমস্ত সাহিত্যেই ছিল তাঁর অখন্ড উত্তরাধিকার। স্ত্রীকে লেখা ১৯৫৪-৫৫ সালের এক চিঠিতে জানা যায় —

"কাল আমি হান্স রয়েসের 'অন টপ অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বইটি শেষ করলাম। বইটি মেরু অঞ্চলের এস্কিমোদের নিয়ে। খুবই হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস...তুমি কি দয়া করে পল এলুয়ার, ডিলান টমাস, পাবলো নেরুদা, পল ভালেরি, রোনাল্ড ফারব্যাঙ্ক, অঁরি মিশো, জাঁ ককতো, এবং জেরার দ্য নেরভালের ওপর নিউ ডিরেকশনস বুক, রুটলেজ আর কেগান পল লিমিটেডের বই জোগাড় করতে পারবে (যদি তোমার অসুবিধা না হয়)? তোমাকে আরনল্ড হসারের দ্য সোশ্যাল হিস্ট্রি অব আর্ট নামে একটি বইয়ের খোঁজ করতে বলেছিলাম। বইটি দুখন্ডের।

আমি স্যাঁত এক্সুপেরির উইন্ড স্যান্ড অ্যান্ড স্টারস বইটি পড়ে শেষ করলাম। শেষ অধ্যায়টি ছাড়া বইটি আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে...।"৭

১৯৫৫-র ৫ই মে করাচি থেকে লেখা এক চিঠিতে জানা যায় —

"আমার অনুরোধে বাড়ির বয়স্ক মহিলাটি তাদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার একটি কপি আমাকে দিয়েছিলেন। বইটির কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে আমি সত্যি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম।"৮

আবার, ১৯৫৪-র ২৬ ডিসেম্বর লিখিত পত্রে জানা যায় —

"১৯০০-১৯১৪ পর্যন্ত প্যারিসের শিল্প ও সাহিত্যের জগতের ওপর একটা বই পড়ছিলাম। ...বইটিতে বলা হয়েছে, পুরো সময়টিই ছিল খুব প্রাণবন্ত, আধপাগল মানুষের ছড়াছড়ি, পরমের সন্ধানে প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর রুচি ছিল তাদের মধ্যে।"৯

শুধুমাত্র পুস্তক পাঠজনিত — অভিজ্ঞতা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমাজ সভ্যতাকেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ সশরীরী অভিজ্ঞতাটুকু ছড়িয়ে আছে তাঁর বিবিধ পত্রের অবয়ব জুড়ে। যেমন — ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম সভ্যতার বিস্মিত বিবরণ পাই ১৯৫৬-র ১২ই সেপ্টেম্বর নাজমুল করিমকে লেখা এক পত্রে —

"I am glad you already know something about Indonesia. It is a carious country because despite the fact they are supposed to be Muslims like us– they are yet so different. Perhaps Indonesia is the only country in the world where Islamic democracy could be practiced. Islam did not come here as conquerors and empire–builders".১০

১৯৫৫-র মে মাসে লেখা এক চিঠিতে আবার, নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ করাচির পারসি সম্প্রদায়ের বর্ণহীন মৃতবৎ পরিবার-জীবন এবং তাদের আস্তিত্বিক বিপন্নতার চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে।

অন্যদিকে, দেশীয় সময়-সমাজের বহুস্বরিক আখ্যানের বিচিত্রধর্মী ইঙ্গিত পাওয়া যায় হৃষিকেশ লাহিড়ীকে লিখিত তাঁর পত্রসমূহে। ২৯।১২।৪২ তারিখে(১১) লিখিত পত্র দুটিতে দেশজুড়ে অন্নহীনতার তীব্র হাহাকার ও পশুশক্তির গভীর পদশব্দ ধ্বনিত হয়েছে। আবার ২০।০৯।৪৮ তারিখে লিখিত পত্রে কায়েদে আজমের মৃত্যু-পরিণতিজনিত অপরিমেয় ক্ষতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। অধঃপতিত, অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা ও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সহায়তাতেই কায়েদে আজমের যাবতীয় গুরুত্ব। প্রসঙ্গত, তৎকালে দেশবিভাগ ও হিন্দু-মুসলমান অবস্থানটি পত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সুবাদে তাঁর সমাজ-বীক্ষণটি আরও সুচীমুখ হয়ে ওঠে। ১৯৪০-এর শুরু থেকে বামপন্থী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পরেও প্রগতিশীল লেখক, শিল্পি ও আত্মগোপনকারী কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকে। ১৯৪৪-এর ৭ নভেম্বর সহপাঠী, সাংবাদিক এবং বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নুরুদ্দিনকে লেখা চিঠি থেকে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর মৃদু পরোক্ষ অঘোষিত অথচ অনিবার্য সমর্থনের ইঙ্গিতটুকু পাওয়া যায় —

"আমার রাজনীতিক মতবাদ সম্বন্ধে এবং তার রূপ সম্বন্ধে আজো তোমার ধারণা স্পষ্ট হয়নি, তার কারণ প্রথমতঃ ভুল ধারণা, দ্বিতীয়তঃ এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলচনা হয়নি কখনও। তোমাদের ক্ষেত্র স্পষ্ট করছে কী না করছে, সে-কথা ভেবে কখনও লিখি না, কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো কী একটা শব্দ লিখেছি বলতে পারো"? ১২

কেবল পূর্ববাংলা নয়, বিশ্ব-রাজনীতির দ্বান্দ্বিক পরিসরে মত ও মতান্তরের অস্থির সংকট মুহূর্তেও তিনি গভীর ভাবে ভাবিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবে, সমাজতন্ত্রের প্রতি মৃদু পক্ষপাতিত্বটুকু বারবার ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। শুধু পত্রে নয়, 'কদর্য এশীয়' উপন্যাসেও তার পরোক্ষ ছায়াপাত দুর্লক্ষ থাকে না। অ্যান মারির স্মৃতিচারণাতেও স্পষ্ট জানা যায় — "হ্যাঁ, ও মার্কসবাদী ছিল" তাছাড়া, পাঁচ ও ছয়ের দশকে ঔপনিবেশিকতা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির কালপর্বে; মাও যে দং-এর প্রতিশ্রুতি, বানদুং শান্তি সম্মেলন এবং চৌ এন লাই, নাসের, নক্রুমা, কাস্ত্রোর জোট আন্দোলনে লেখকের গভীর মানসিক স্বস্তি ও সর্বোপরি আলজেরিয়ার স্বাধীনতা উৎসবে পাকিস্তানের প্রতিনিধি রূপে যোগদান ও চে গুয়েভারার সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎকারে তাঁর সমাজতান্ত্রিক অস্তিত্বটি গোপন থাকে না কিছুতেই।

আন্তর্জাতিকতার পাশাপাশি, সমকালের দেশীয় ঘটনার জটিল আবর্তগুলিতেও তিনি নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। ইউনেস্কো থেকে চাকরিচ্যুত আর্থিক অনিরাপত্তায় আক্রান্ত ওয়ালীউল্লাহ্ প্যারিসে অবস্থান করেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

ফরাসি একাদেমীর সদস্য পিয়ের এমানুয়েল, আঁদ্রে মালরো প্রমুখের মাধ্যমে বিশ্বজনমত গঠনে সচেষ্ট হলেও জর্জ পম্পিডুর ফরাসি সরকারের সাম্রাজ্যবাদী ও পাকিস্তানমনস্ক ভূমিকা তাঁকে গভীর মর্মাহত করে। পূর্ব বাংলার জনজীবনে পাকিস্তানি সৈন্যদের রক্তাক্ত হত্যালীলার কথা প্রায় অপ্রকাশিত থেকে যায় ফ্রান্সে। দেশ ও দেশীয় জনগণের জন্য চূড়ান্ত উদ্বিগ্ন ওয়ালীউল্লাহ১৯৭১-এ মাহমুদ শাহ কোরেশীকে পত্র মারফত জানান —

"ফরাসীরা আমাদের বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ছে। (প্রথম খুব লেখালেখি হয়েছিলো কাগজপত্রে)। ওখানে আমরা কিছু একটা না করতে পারলে দুনিয়ার উদাসীন ভাব স্বাভাবিক। আমি বিশেষভাবে খবর শূন্য বোধ করছি। কিছু খবর পাঠান, কিছু যোগাযোগ দরকার"। ১৩

যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন ওয়ালীউল্লাহ্ লন্ডনের বাঙালিদের সঙ্গে সংযোগরক্ষার মাধ্যমে কিছু খবর পেতেন। তবুও অদমনীয় তার অস্থিরতা। ৭১-এর ২৫ জুন শওকত ওসমানকে পত্রে তিনি জানাতে চান — "তুমি লিখেছো ৬২ জন প্রোফেসরকে মেরেছে। এখানে আমার পুরো ফর্দর প্রয়োজন — নামধাম, মৃত্যুর দিন, অন্যান্য বিবরণ। অন্যদের খবর থাকলেও পাঠাবে"। ১৪

ফরাসি সরকারের মার্কিন তাঁবেদারিত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের বৈপরীত্যমূলক ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ওয়ালীউল্লাহ্ ৭১-এর ৩০ জুন শওকত ওসমানকে আবার লেখেন —

"অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কিছু বলবে এমন লোক নেই আর। বরঞ্চ মার্কিনিদের দলে যোগ দিয়ে চুপি চুপি জাহাজ ভরতি সামরিক মালরসদ পাঠাচ্ছে এহাইয়া খানের সাহায্যার্থে"১৫

উপরন্তু মুক্তিসংগ্রামে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য পূর্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমর্থন করলেও চীনের সামরিক বিরোধিতা তাঁকে তীব্র বিষণ্ণতায় নিমগ্ন করে। বিশ্বজনমত ক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বরতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেও তাঁর উদ্বেগ প্রশমিত হয় না কিছুতেই। মৃত্যুর মাত্র চার দিন পূর্বে ৭১-এর ৫ অক্টোবর শওকত ওসমানকে লেখা পত্র জুড়েও আততি ও উদ্বেগ কাতরতায় কেবল স্বদেশ- কেবল স্বজন। ঘটনার মর্মান্তিকতা এটাই যে তাঁর স্বপ্নের স্বদেশ যখন অজস্র রক্তপাত, আত্মাহুতির বিনিময়ে স্বাধীনতার মুখ দেখল, তিনি সশরীরে সেই আলোক মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারলেন না। ৭১-এর ১০ অক্টোবরে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আমাদের বিষণ্ণ করলেও তাঁর অপ্রতিরোধ্য ও অনন্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের বিস্তৃত ভূখণ্ডে, যার প্রতিধ্বনি আজও সংশয়হীন ভাবে শোনা যায়।

অন্যদিকে, অস্তিত্ব বোধের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রয়োগ শুধুমাত্র তাঁর সাহিত্য-অবয়বে গহীন অন্তর্লোকেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা বিস্ফারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত পত্র-চরাচরে। নীরবতার ভিতরে এক গাঢ় স্তব্ধতার তীব্র অনুরণন তাঁর বোধের অন্তর্দেশে প্রায় সমস্ত জীবন জুড়েই জলের আকাঙ্ক্ষায় শিকড়ের যন্ত্রণাক্লান্ত উচ্চারণের অস্তিত্বের মতো নিদ্রাহীন জেগে ছিল। জীবনের উদ্দেশ্য-গন্তব্য-তথা পরিণতির স্পষ্ট ধারণা তথা একটি সিদ্ধান্তের লক্ষ্যে আকণ্ঠ মানসিক রক্তাক্ত অভিযান তিনি পরিচালিত করেছেন সামুদ্রিক নাবিকের মতোই। ব্যক্তি-সামাজিক ও নৈতিক সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আত্মপ্রশ্নে অবিরাম ক্রুশবিদ্ধ হয়ে কখনও কখনও আক্রান্ত হয়েছেন প্রগাঢ় বিষণ্ণতায়। তবু জীবনকে ভালবেসে প্রতি মুহূর্তেই বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার গভীর পদশব্দ তাঁর জীবনরীতিতে স্পন্দিত এবং ধ্বনিময় —

"পৃথিবীটা এত অপূর্ব। অদ্ভুত ব্যাপার হল, এ উপলব্ধি কাউকেই আনন্দ দেয় না। এ এমন এক বিদঘুটে উপলব্ধি যা মন খারাপ করে দেয়। আমারও সেই অনুভূতিই হচ্ছিল। এ সৌন্দর্য উপলব্ধির পাশাপাশি বিষণ্ণতার কারণ কি এটাই যে, এর ফলে মানুষ একথাও বুঝতে পারে, এ সৌন্দর্য ফেলে চলে যেতে হবে? কেন?" ১৬ (১৯৫৪-র ৪ ফেব্রুয়ারি স্ত্রীকে লিখিত পত্র)

আবার, ১৯৫৪-র ২৬ অক্টোবর স্ত্রীকে লিখিত পত্রে তাঁর বক্তব্য — প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষই প্রকৃত প্রস্তাবে একক অস্তিত্ব চিহ্ন এবং সে কারণে মানব সমাজে তার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা হেতু অনিবার্য ভাবেই নেমে আসে নিঃসঙ্গতা একাকিত্বের অমোঘ অভিশাপ অথবা অসুখ। ওয়ালীউল্লাহ্ এই ব্যাথার কালো আকাশটিকে গভীর ব্যাথায় উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর ভালোবাসার আর্তির নির্জন কণ্ঠস্বর যেন আমরা চিনে উঠতে পারি নির্মিত সাহিত্যের ভিতর। অপূর্ণ 'আমি'কে পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায় তিনি নতজানু হয়েছেন এক অনন্য ঈশ্বরের কাছে, যার নাম ভালবাসা। কিন্তু একথাও তাঁর বোধের অগোচর নয় যে মানুষে মানুষে ভালোবাসার ঐক্যের সম্মিলিত সেতুর নির্মাণ আশ্চর্য কঠিন, কারণ প্রত্যেকেই আমরা 'আমির আবরণ'টিকে সহজে ভাঙতে পারি না —

"আমরা এত সহজে মানসিক ভাবে নগ্ন হতে পারি না। মনের ওপর একটা পর্দা ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজন হলে বুঝতে হবে তোমার পক্ষে নগ্ন হওয়া সম্ভব নয়"। ১৭

প্রতিবন্ধকতার এই কাঁটাতার মানব জীবনের স্বাধীনতার একান্ত বিরুদ্ধগামী।

আলোচনান্তে বলা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিঠিপত্রের ভাষিক চতু স্পর্শ অন্তর্দেশ থেকে আন্তর্জাতিক চিন্তন রেখায় গভীর শিল্পিত হয়ে পরিণত হয়েছে স্বয়ং এক প্রশ্নাতীত সাহিত্য-শরীরে। তাঁর ব্যক্তিমানসে সমাজ এবং সাহিত্য এক অবিচ্ছেদ্য ধারায় গ্রথিত তাঁর পত্রসমূহের গভীর বয়ানে। তাঁর শব্দময় বলয়ের পৃথিবীতে মানুষ একটি প্রজাতীয় নাম মাত্র নয়, বরং সুস্পষ্ট একটা প্রশ্ন-অভিযান যা পূর্ণতার ব্যর্থতায় তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাবিদ্ধ। ঐতিহ্য এবং ভবিতব্যের দ্বান্দ্বিক চিৎকারের আবর্তে উচ্চকিত তাঁর কণ্ঠস্বরটি বিস্তৃত হয়ে যায় পত্রপাঠকের নিভৃত বুকের অতলতায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য", মনন প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম মনন সংস্করণ বইমেলা ২০০৮, পৃ-৫৬

২। আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ "আমার স্বামী ওয়ালী'। অনুবাদ শিবব্রত বর্মন, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-৪৩

৩। শামসুদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৭। পৃ-৫৬

৪। ঐ, পৃ-৫৬

৫। আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ "আমার স্বামী ওয়ালী'। অনুবাদ শিবব্রত বর্মন, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-৪৯

৬। সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য", মনন প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম মনন সংস্করণ বইমেলা ২০০৮, পৃ-৭০

৭। আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ "আমার স্বামী ওয়ালী'। অনুবাদ শিবব্রত বর্মন, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-৩৯-৪০

৮। ঐ, পৃ-৪১

৯। ঐ, পৃ-৪৪-৪৫

১০। সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য", মনন প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম মনন সংস্করণ বইমেলা ২০০৮, পৃ-৬৯

১১। আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ-১৫৮-১৬০

১২। সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য", মনন প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম মনন সংস্করণ বইমেলা ২০০৮, পৃ-৩৮৯

১৩। ঐ, পৃ-৯৫

১৪। ঐ। পৃ-৯৭

১৫। ঐ। পৃ-৯৭

১৬। আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌ "আমার স্বামী ওয়ালী'। অনুবাদ শিবব্রত বর্মন, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১২, পৃ-৬২

১৭। ঐ, পৃ-৬৯

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১

২। আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্ ''আমার স্বামী ওয়ালী'। অনুবাদ শিবব্রত বর্মন, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা,প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১২

৩। জীনাত ইমতিয়াজ আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ঃ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, নবযুগ সংস্করণ ২০০১

৪। তপোধীর ভট্টাচার্য, 'উপন্যাসের সময়', এবং মুশায়েরা, কোলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৯

৫। শামসুদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যে প্রতীচ্য প্রভাব', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৭

৬। সাজ্জাদ শরিফ(সম্পাদক), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রন্থিত রচনা গল্প প্রবন্ধ সমালোচনা, স্মৃতিকথা ও চিঠি', প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৩

৭। সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য'', মনন প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম মনন সংস্করণ বইমেলা ২০০৮

পত্রিকা ঃ

১। 'নান্দীপাঠ', ঢাকা, সংখ্যা ছয়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪